OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 383 - 391
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

গান দিয়ে দ্বার খোলাবো : প্রসঙ্গ ‘অচলায়তন’ ও ‘রক্তকরবী’

ঊষসী সাহা
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
Email ID: sahaushasi2003@gmail.com
0009-0004-5699-9009

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Society, Power dynamics, Social consciousness, Stereotype, Freedom, Labour, Music, Social reform.

Abstract
Music is a devine gift to mankind. Music begins where language ends, expressing what the soul feels but words cannot. Rabindranath Tagore believed in the magical power of music. So as a social worker he chose the music and it's emotional resonance to touch the heart of common people. According to his wish music became an integral part of education in shantiniketan. because Rabindranath though that besides artistic value music should also have a great impact on society. From childhood Rabindranath had a connection with contemporary politics because his family are politically active during Swadeshi movement and Bangabhanga movement. The two plays by Rabindranath Tagore, Raktakarabi (Red Oleanders) and Achalayatan, represent a unique blend of author's social consciousness and aesthetics. In these plays Rabindranath shed light on the pros and cons of the social system like power structure of the society, interaction between individual and social structure, autocracy, capitalism etc. In the play Raktakarabi, there is a town named Jakkha puri. This is a capitalist system established and controlled by a aggresive governing authority. Sardars and Morols are the pillar of this power structure. In such system labours are exploited and converted into a number only. They have lost their existence as an individual or human being. They have no time for themselves in a day. So the weekend, when there is actually a holiday, they cannot enjoy because they are turned into a machine. Vishu Nandini and Ranjan has made a revolt against this system. As a result Ranjan died. The whole story is covered by the songs of the play, as author used the songs as an weapon to spread awareness. On the other hand in the play achalayatan, there is three community - Achalayotonik, Syonpanshu and Darbhak. each of the class has their own, distinct ideology which is influenced by the power dynamics, division of labour, way of living, and constitution, of the concerned class or society. These all dimensions are clearly indicated in the songs of the play. So In case of the above-mentioned text, songs/ music plays a crucial role to convey the critical message or idea of author.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

সঙ্গীত আসলে স্বতঃ উৎসারিত। আনন্দে, দুঃখে, বেদনায় বা অন্যান্য অনুভবের মুহূর্তেও মানুষের কাছে ভাবাবিষ্ট মনটাকে মেলে ধরবার অন্যতম উপায় হল গান। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন –

> "বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বাচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ গানের বিশেষ করে সুরের এই হৃদয়ভেদী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন বলেই তার সমাজ চিন্তার সঙ্গে গানের একটা গভীর যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ গানের মধ্যে কথা ও সুরের সহজ সমন্বয়ে বিশ্বাসী। তিনি তার জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে দিয়ে গানকে জুড়ে দেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে, বৃহত্তর অর্থে সমাজের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলির মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্ করা যায়। কেননা মনে রাখা দরকার এই নাটকগুলি আসলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা, আর্থসামাজিক সচেতনতার নান্দনিক রূপায়ণ। রক্তকরবীর মত নাটকে সংলাপের থেকেও বেশি, গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নাটকের ভাব বস্তু তথা নাটক রচনার পিছনে নাট্যকারের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। গানগুলি হয়ে উঠেছে নাট্যকারের সমাজ চেতনার ধারক ও বাহক। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন সমাজকর্মী তখনও মানুষের কাছে পৌঁছতে তার মূল হাতিয়ার গান। তিনি যখন শ্রীনিকেতনে গ্রাম সংগঠনের কাজে হাত দিয়েছেন, তখনও গ্রামের মানুষকে গায়ের জোরে ডাকেননি, ডেকেছেন গানের সুরে –

> "সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজে।"[২]

এরপর ছাত্ররা এসে গ্রামের কাজে যোগ দিলো। খেলা আর কাজ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কবি এবং ছাত্ররা এক সুরে বলে উঠলেন—

> "মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ শুনিসনি কি ভাই।"[৩]

বিশ্বভারতীর শিক্ষক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রসঙ্গে তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামাজিক মূল্য' নামক প্রবন্ধে। তার কথায়—

> "এই সেদিন এলমহার্স্ট সাহেব বলছিলেন; শ্রীনিকেতনের কার্যভার নেবার আগে গুরুদেব তাকে বলেছিলেন, গ্রামের কাজ করবার জন্য তোমাকে বাংলা শিখতে হবে না। একটি গান শিখলেই হবে 'আমরা চাষ করি আনন্দে'। ওই একটি গানের বিদ্যা নিয়ে তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বহু বৎসর আমাদের গ্রামবাসীদের সেবা করে গিয়েছেন।"[৪]

শুধু গ্রাম সংগঠনের কাজেই নয়, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় এর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ গানকেই করে তোলেন বিদ্যাচর্চার অন্যতম উপকরণ। তাঁর গানের সুরে নানান ঋতু রূপে - রসে – রঙে - গন্ধে অপরূপ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা মন পবনের নাও বেয়ে পৌঁছে যায় কোন এক অচিনপুরে, রূপকথার রাজ্যে। এই শিক্ষার্থীরা যেন সেই শারদোৎসব নাটকের বালক দলেরই প্রতি রূপ। ফলত সমাজকর্মী রবীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্রই হল—

> "আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।"[৫]

তিনি সংগীত বা গানকে সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন সৃষ্টি বা ব্যক্তি মনের রসকল্পনা চরিতার্থতার উপায় রূপে দেখতে চান না। তিনি বিশ্বাস করেন –

> "সঙ্গীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপর সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।"[৬]

এর পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথে তাঁর নাটকের গানগুলিতে সমাজের নানান ব্যবস্থাপনাকে যেমন বিশ্লেষণ করেন, তেমনই গানের মধ্যে সমাজের বাঁধা ছক ভেঙে ফেলার ডাক দেন। ভারতীয় সমাজের চেহারা চরিত্র, তার বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি, তার সংস্কৃতির ধাঁচ রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একদিনে আবিষ্কার করেননি। বরং ছেলেবেলায় হিন্দুমেলা ও এমন নানান জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগের সূত্রে বা পরে জমিদারি পরিচালনার সূত্রে মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিনতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এর বহুপরে রবীন্দ্রনাথ যখন পরিণত বয়স্ক এবং পরিণত মনস্ক কবি, তখন ঔপনিবেশিক সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পঙ্কিল রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে। আর অন্যদিকে ভারতীয় সমাজ কাঠামোর পচনশীল, সংস্কারাচ্ছন্ন, দুর্বল দিকটিও প্রত্যক্ষ করছেন বিশ্বকবি। সমাজের এই জড়তা, সংস্কারান্ধ প্রকৃতি, প্রথানুগত্যই যে সব সর্বনাশের মূল – সেকথা উপলব্ধি করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন নাটকে সামাজিক ব্যবস্থাপনা তথা সমাজের গঠন, পরিকাঠামো, ক্ষমতার বিন্যাস, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মনের সম্পর্ক প্রভৃতির মূল্যায়ন করেন, তেমনি সমাজের ক্ষয় ঠেকাতে আচার-আচরণ-চিন্তন মনন সমস্ত ক্ষেত্রে জড়তা, সংস্কার, গতানুগতিকতা থেকে মানুষকে মুক্ত করার বার্তা দেন। নাটকের গানের মধ্যে ধরা থাকে পুরো বৃত্তটি।

উদাহরণস্বরূপ আলোচনা করা যায় রক্তকরবী নাটকটির কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে এই নাটকটির মূল উপজীব্যই হল কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষকে চাকরি, মুনাফা, স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দেখিয়ে কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে। যে কারণে এই নাটকে ফাগুলাল, বিশু, চন্দ্রার মত মানুষেরা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শহর যক্ষপুরীতে আসে চাকরির খোঁজে। তারা যে কেবল তাদের বাসস্থান ছেড়ে এসেছে তা নয়, তারা ছেড়ে এসেছে তাদের সংস্কৃতি, তাদের শিকড়।

আলোচ্য নাটকের প্রথম গান ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’, যাকে এই নাটকের থিম সং বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গানের মাঝে মাঝে গেঁথে দেন সংলাপ অর্থাৎ শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নয়, গানের প্রয়োগ কৌশলের ক্ষেত্রেও তিনি চেনা ছককে ভেঙে ফেলতে চান। গান ও নাটকের ভাব বস্তু যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যেমন রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরের রাজার কানে পৌঁছালো ফসলের গান —

“পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'
আয়রে চলে আয়
আয় আয় আয়।।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।”[৭]

নন্দিনী রাজাকে বলে—

“দেখছো না পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?”[৮]

নন্দিনীর এই অনুভব, মাটির প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, নন্দিনীর এই টান তো কেবল নন্দিনীর নয়, এতো প্রতিটি মানুষের অনুভব। কেননা প্রত্যেক. মানুষ তার মনের মণিকোঠায় লালন করে শিকড়কে ছুঁয়ে থাকার বাসনা। আর প্রকৃতির থেকে বড় উৎস, বড় শিকড় মানুষের আর কিই বা আছে। সেকারণেই গানের পরবর্তী পংক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন প্রকৃতির সেই অপার ঐশ্বর্য, মহিমামন্ডিত রূপ, যা মানুষকে আশ্রয় দেয়।

“হাওয়ার নেশা উঠলো মেতে
দিগবধূরা ধানের ক্ষেতে
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।
মরি হায় হায়।।”[৯]

নন্দিনী বিশ্ব পৃথিবীর এই আনন্দধারায় স্নাত হতে চায়, তবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে। তাই সে রাজাকেও এই উৎসবে শামিল করতে চেয়েছে।

> “মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল/ ঘরেতে আজ কে রবে গো /খোলো খোলো দুয়ার খোলো খোলো/ খোলো দুয়ার খোলো।”[১০]

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভূ যক্ষপুরীর রাজা পারলেন না পৌষের ডাকে সাড়া দিতে। এতটাই বিরুদ্ধতা, এতটাই বিচ্ছেদ কৃষির সঙ্গে যক্ষপুরীর সভ্যতার। প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে মানুষের এই চির আমন্ত্রণ অথচ মানুষের স্বার্থ, ভোগ-সুখের নেশা তাকে কি প্রচন্ড বাঁধনে বেঁধেছে, যা এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারোর নেই। এই পুরো বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ‘পৌষ তোদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ডাক দিয়েছে' গানটির মধ্যে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ এক অসাধারণ কৌশলে নিছক প্রকৃতির গানকে আশ্রয় করে জীবনের এক গূঢ় সত্যকে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। তবে শুধু রাজা নয়, এই বিচ্ছেদের বিষে জর্জরিত শ্রমিক (খোদাইকর) ফাগুলাল, তার স্ত্রী চন্দ্রা, বিশুর মতো গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষগুলো। ফসলের গান, নবান্নের গান তাদের কানেও পৌঁছায় কিন্তু ছুটি মেলে না যক্ষপুরীর জাঁতাকল থেকে। যক্ষপুরীর সর্দার - মোড়লেরা এই মানুষগুলোকে উদয়াস্ত খনি থেকে সোনা তুলে আনার কাজে নিযুক্ত করে কেড়ে নিয়েছে তাদের অবসর। তারা ভুলতে বসেছে জীবনের মাধুর্য। যে কারণে আশ্চর্য এক শূন্যতা, গ্রাস করেছে ফাগুলাল ও চন্দ্রার দাম্পত্য ছুটির দিনে ফাগুলালের দেখা মেলে মদের আড্ডায়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার আবারো যক্ষপুরীর সমাজ ব্যবস্থাকে সমালোচনা করেন বিশুর গান ও সংলাপের মধ্য দিয়ে। বিশু চন্দ্রাকে বলে—

> "স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমনকি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে... অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি।"[১১]

চন্দ্রা বলে—

> "এইগুলোকে মদ বলে নাকি।"[১২]

তাতে বিশুর উত্তর—

> "প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধ কাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে।"[১৩]

বিশুর উপলব্ধি আরো প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নাটকে উল্লিখিত তার গানে—

> "তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে, /তবে মরণ রসে নে পেয়ালা ভরে।/ সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা/ সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,/ সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙিন করে।"[১৪]

অর্থাৎ যক্ষপুরীর অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কিভাবে শ্রমিকদের জীবনযাত্রাকে যান্ত্রিক করে তোলে, প্রকৃতির সহজ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে-- তা উপরোক্ত দুই গানের মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রমিকদেরকে মদের নেশায় ভুলিয়ে রাখা যক্ষপুরীর ক্ষমতা তন্ত্রের একবিশেষ কূটনৈতিক চাল। শ্রমিকদের অবসর এবং কর্মব্যস্ততার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যকে নষ্ট করে তাদের মানসিক স্থিতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাদের চিন্তার ক্ষমতা, যক্ষপুরীর প্রকৃত স্বরূপটিকে চিনে নেবার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। যেকারণে এখানকার সামাজিক ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলোকে কেড়ে নিলেও, শ্রমিকরা কখনো ভয়ে, কখনো অন্ধ আনুগত্যে প্রতিবাদ করতে পারে না। বিশু বলে—

> "আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘন্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।"[১৫]

তবে যক্ষপুরীর শ্রমিকদের শূন্য জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে হাজির হল নন্দিনী, তার প্রেমের ডালি নিয়ে। রঞ্জনের প্রতি তার গভীর প্রেমই তার শক্তি, যার বলে সে সর্দার - মোড়লদের ক্ষমতা তন্ত্র, সর্বোপরি যক্ষপুরীর সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আবারও প্রচলিত পথে না হেঁটে বিপ্লবের মাঝেই বুনে দিলেন প্রেমের উপাখ্যান। যদিও রঞ্জন- নন্দিনী ছাড়াও আরো একজন প্রেমের পথ ধরে নিজের লড়াই লড়তে চেয়েছিল, সে বিশু। বিশু তার প্রথম জীবনে নন্দিনীকে নিজের করে পেতে চাইলেও নন্দিনী তাতে সাড়া দেয়নি। পরবর্তীকালে বিশু যখন যক্ষপুরীতে, একেবারে অকেজো, মনেপ্রাণে বিধ্বস্ত, তখন নন্দিনী আবার তার জীবনে ফিরে এলো দুখ-জাগানিয়া হয়ে। ততদিনে প্রেম জনিত ঈর্ষা, অধিকার বোধ, সংকীর্ণতার থেকে বিশু তার মনকে মুক্তি দিতে পেরেছে। নন্দিনী তার মনে বয়ে এনেছে মুক্তির হাওয়া। সে কারণেই বিশু গেয়েছে—

> "মোর স্বপন তরীর কে তুই নেয়ে!/ লাগলো পালে নেশার হাওয়া,/ পাগল পরান চলে গেয়ে।/ আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা/ তোর দুলিয়ে দিয়ে না/ তোর সুদূর ঘাটে চলরে বেয়ে।"[১৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রা যখন মজা করে বলে—

> "তবে তো আশা নেই, আমরা - যে বড়ো কাছে।"[১৭]

অর্থাৎ চন্দ্রা বুঝতে পেরেছে এখানে তরীর নেয়ে আসলে নন্দিনী, যে বিশুর মনকে সচল করে। তার চিন্তার ক্ষমতাকে উসকে দেয়। সেই অর্থে নন্দিনী বিশুকে বাঁচার রসদ জোগায় অর্থাৎ বিশু-নন্দিনীর সম্পর্ককে পুরুষ-নারীর প্রেমের চেনা ছকের বাইরে এক নতুন সংজ্ঞায় বাঁধলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সম্পর্ককে আমরা বলতে পারি Comrade Ship। তারা সহযোদ্ধা। বিশুর নিজের কাছেও নন্দিনী তার 'চির দুঃখের দূরের আলোটি', 'তার অগম পারের দূতী'। নন্দিনীর সংস্পর্শেই বিশু নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়। সে নন্দিনীকে বলে—

> "যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি, মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।"[১৮]

সংলাপের সমান্তরালে বিশুর এই আত্মোপলব্ধির আবেশ ছড়িয়ে আছে তার গানেও—

> "আমার কাজের মাঝে মাঝে/ কান্না ধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।/ আমায় পরশ করে/ প্রান সুধায় ভরে/ তুমি চাও যে সরে,/ বুঝি আমার ব্যথার আড়ালে তে দাঁড়িয়ে থাকো/ ওগো দুঃখ জাগানিয়া!"[১৯]

খেয়াল করলে দেখা যায় কিশোর, ফাগুলাল এমনকি রাজাকেও যক্ষপুরীর ক্ষমতাতন্ত্র, সামাজিক ব্যবস্থাপনার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করেছে নন্দিনী। এই ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের কেবল যে আটকে রেখেছিল তাই নয় বরং একবিশেষ জীবন-যাপনে তাদের এমনভাবে অভ্যস্ত করেছিল যে সেই বাঁধা ছকের বাইরে কিছু ভাববার, কোন সৃষ্টিশীল কাজে নিজেদের নিয়োগ করবার ইচ্ছে বা শক্তি কোনটাই শ্রমিকদের ছিল না। বিশুর কথায়—

> "সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদিবা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।"[২০]

অর্থাৎ এই যান্ত্রিকতা যেন শ্রমিকদের প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠেছে, যেকারণে নন্দিনীকে গোকুল বা ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা ভালো চোখে দেখেনি। কেননা নন্দিনী যক্ষপুরীর আপাত ভাবে স্থিতিশীল, ছকে বাঁধা যাপন লিপিকে তছনছ করে দেয়।

ফলত বোঝাই যায় প্রথমেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্দার-মোড়লদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ হাঁটলেন সম্পূর্ণ অন্য পথে। নন্দিনী তার মন দিয়ে রাজার মনকে জাগিয়ে তুলল। রাজা নিজের শ্রান্ত, রিক্ত অন্তঃকরণ মেলে ধরলেন নন্দিনীর কাছে। বললেন—

> "সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে, মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।"[২১]

এর প্রতিক্রিয়ায় নন্দিনী সেভাবে কথা বলেনি। বরং গান গেয়ে রাজার মনের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করে। একাধারে রাজার একাকীত্ব, শ্রান্তি, অন্যদিকে নন্দিনীকে ঘিরে রঞ্জন এর প্রতি রাজার ঈর্ষা, আগ্রাসী মনোভাব— এই সমস্ত কিছুর প্রতিষেধক রূপে, নন্দিনী ভালোবাসার একটা বিরাট অর্থ রাজার কাছে তুলে ধরতে চায় তার গানের মাধ্যমে, যেখানে ভালোবাসা প্রেম বিরহ যেন পরস্পর পরিপূরক। নন্দিনী গায়—

"ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে - স্থলে বাজায় বাঁশি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আকাশে কার বুকের মাঝে/ ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি।
সেই সুরে সাগর কূলে/ বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।/ সেই সুরে বাজে মনে/ অকারনে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।”[২২]

নন্দিনী থুড়ি রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমের দর্শনকে সমাজের বাঁধা ছকে মাপা যায় না। সেকারণেই রবীন্দ্রচেতনায় বিরহপ্রেমের অন্যতম পাথেয় স্বরূপ বিবেচিত হয়। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন—

“আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো।।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর - কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো।”[২৩]

প্রেমের এই ধারণা বুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন রক্তকরবী নাটকে শাসকের মন বদল ঘটান, সেখানেও নন্দিনী এবং বিশুর গান একটা বিরাট ভূমিকা নেয়।

‘রক্তকরবী’ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বহু নাটকেও গানের এই সামাজিক মাত্রা অনুধাবন করা যায়। রক্তকরবী নাটকের বহু আগে রচিত হয়েছিল অচলায়তন নাটকটি। সমালোচকদের কাছে এই নাটকের তাত্ত্বিক দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে বারবার। প্রমথনাথ বিশী এই নাটকে অচলায়তনিক, শোনপাংশু ও দর্ভক— এই তিন সম্প্রদায়কে তিনটি পৃথক সাধনমার্গের প্রতীক বলে মনে করেছেন। যথা— জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ ও ভক্তি মার্গ।

আলোচ্য নাটকে রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা সেভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি বলেই প্রমথনাথ বিশীর অভিমত। তিনি বলেন—

> “শিল্পসৃষ্টি হিসেবে অচলায়তনকে ত্রুটিহীন বলা চলে না। ইহার অধিকাংশ চরিত্রই রক্তাল্পতা ব্যাধিগ্রস্ত, ছায়াপ্রায় আইডিয়ার মুখোশ মাত্র। ...এই প্রসঙ্গে অচলায়তন নাটকের পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের জীর্ণতা ও অর্থহীন আচার পরায়ণতাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে যে কাঠামোটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার কোনো মিল নাই।”[২৪]

প্রমথবাবুর এই মন্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি সহমত হওয়া যায় না। অচলায়তন নাটকে ঠিক হিন্দু সমাজের প্রচলিত মূর্তিটি দেখতে পাওয়া না গেলেও, তিনটি পৃথক সম্প্রদায়, তাদের পৃথক পৃথক জীবন যাত্রা সংস্কৃতি — তিন ধরনের সমাজ কাঠামোর সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে। এই তিন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শ কোথাও গিয়ে - সমাজকাঠামো, সেই সমাজে ক্ষমতার বিন্যাস, শ্রমের বিন্যাস, জীবন চর্চা প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নাটকের অল্প কয়েকটি গানের মধ্যে তার আভাস দিয়েছেন।

নাটকের কাহিনী অনুসারে দেখা যায় অচলায়তনিকদের এর জীবন মন্ত্র-তন্ত্র-শাস্ত্র - আচমন বিধি - প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তারা আশ্চর্য এক সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে, বাইরের বৃহত্তর সমাজ ও জীবনের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। বরং যোগ স্থাপন করতে গেলেই সুভদ্রের মতো শাস্তি পেতে হয়। সে কারণে এমন পরিবেশে, মুক্তমনা পঞ্চকের গানে যে আর্তি ফুটে ওঠে তা ভীষণ তাৎপর্যবহ।

“বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাসে বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপনকথা
কেউ তো আনে না।”[২৫]

সমাজ–জীবন-প্রকৃতি থেকে এই বিচ্ছেদের কারণে অচলায়তনে সময় যেন থেমে গেছে। জীবনের গতি সেখানে রুদ্ধ। সে কারণেই নাটকের শেষে অচলায়তন প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর তথা গুরু আচার্যকে বলেছিলেন—

> “যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যই আজ আমি এসেছি।”[২৬]

কিন্তু এই বিচ্ছেদের কারণ বোধহয় কেবল সংস্কার বা প্রথানুগত্য নয়।

পাঠকেরা খেয়াল করবেন, বিভিন্ন ধরনের কায়িক শ্রম অর্থাৎ একেবারে ভূমি লগ্ন বেশকিছু জীবিকার সঙ্গে এবং সেই জীবিকাশ্রয়ী মানুষদের সঙ্গে অচলায়তনিকদের তীব্র বিরোধ রয়েছে। শোনপাংশুদের খেঁসারি ডাল চাষের প্রসঙ্গে পঞ্চক ও শোনপাংশুদের কথোপকথন লক্ষ্যণীয়। পঞ্চকের কাছে শোনপাংশুদের প্রশ্ন—

> “কিন্তু পঞ্চক দাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?”[২৭]

পঞ্চক বলে—

> “বলতে পারি নে – কি জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস – সেইটে যে বড় দোষ। তোরা চাষ করিস তো? ... কাঁকুড়!ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষও করিস বুঝি?”[২৮]

তাতে তৃতীয় শোন পাংশু উত্তর দেয়—

> “কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেসারি ডাল তোমাদের বাজারে যায়।”[২৯]

প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাবে মার্ক্স কথিত alienation theory এর কথা। মার্ক্স মূলত চার ধরনের alienation এর কথা বলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল alienation from other people (individual from other individuals)। এই বিশেষ প্রকার alienation পাঠক অচলায়তনিকদের মধ্যে দেখতে পাবেন, যার মূল কথা এই যে—

> “in the capitalist relations of production, not only we are alienated from our human existence, it also means that we are alienated from ourselves and each other in turn. So the dimensions of alienated labour deals with the fact that our social ties are alienated by themselves. Man feels isolated from his own species, relatives and associates. This spreads from man to man, and even to society. For if a man feels conflict with or inside himself, then he is often in conflict with others.”[৩০]

অচলায়তনিকদের মধ্যে পুঁজিবাদী মানসিকতা তেমন প্রকট না হলেও, স্থবির পওনের রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, শোনপাংশু, দর্ভকদের প্রসঙ্গে শুচিবায়ুগ্রস্ততা, জ্ঞানের অহংকার প্রভৃতির নিরিখে পূর্বোক্ত সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এর বিপরীতে শোনপাংশুরা কিন্তু কায়িক শ্রমের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। তাই তারা গাইতে পারে—

“আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে!
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় যে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরই সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে।”[৩১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এভাবেই প্রকৃতির ছন্দে যখন কাজের ছন্দ মিলে যায়, তখন মানুষ কাজের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পায়। এই আনন্দ, এই প্রাণশক্তি শোনপাংশুদের জীবনের রসদ। যেকারণে তারা অচলায়তনিকদের মত সংস্কারের বশবর্তী নয়। তবে শোনপাংশুরা কৃষিকাজের পাশাপাশি লোহার কাজও করে। তারও হদিস রয়েছে গানে—

"কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!
লক্ষযুগের। অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো, তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ওই জগৎ জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।"[৩২]

অর্থাৎ শোনপাংশুরা লোহা তথা প্রযুক্তিকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে।

শোনপাংশুদের পাশাপাশি দর্ভকদলের মধ্যেও প্রকৃতির সঙ্গে, মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারাও অচলায়তনিকদের মত শ্রম বিমুখ নয়। তাদের ভক্তি গীতির মধ্যেও এর প্রতিফলন রয়েছে।

"আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
...সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজায় বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।"[৩৩]

অর্থাৎ অচলায়তন নাটকের গানের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সমাজ সচেতন মনটির স্পর্শ পাওয়া যায়। নাটকে পঞ্চক যেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিভূ হয়ে সমাজের বাঁধা ছক ভেঙে ফেলার ডাক দেয়। তার গানে—

"আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলবো যে বাইরে।
পালে আমার লাগলো হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।
সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।"[৩৪]

সমস্ত বাঁধন ছিড়ে, গতানুগতিকতাকে ঝেড়ে ফেলে মুক্তির পথে, অনন্তের পথে যাত্রা করাই তো রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাধনা, যার ইঙ্গিত রয়েছে 'রক্তকরবী' ও 'অচলায়তন' নাটকের গানে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গান সম্মন্ধে প্রবন্ধ', সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, পৃ. ২১৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 42
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 383 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজে', গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পূজা ও প্রকৃতি পর্যায়, গান - ৪৮
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ শুনিসনি কি ভাই', গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, স্বদেশ পর্যায়, গান – ২
৪. দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামাজিক মূল্য', ভাষা ও সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো গান দিয়ে দ্বার খোলাবো', গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পূজা পর্যায়, গান - ১২৯
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা', সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, পৃ. ১৭
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, গান, পৃ. ১২
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, নন্দিনীর সংলাপ, পৃ. ১২
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, গান ('পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'), পৃ. ১২
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, গান ('পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'), পৃ. ১২
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর সংলাপ, পৃ. ২৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, চন্দ্রার সংলাপ, পৃ. ২৪
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর সংলাপ, পৃ. ২৫
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর গান, পৃ. ২৫
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর সংলাপ, পৃ. ২৫
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর গান, পৃ. ২২
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, চন্দ্রার সংলাপ, পৃ. ২২
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর সংলাপ, পৃ. ৩৭
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর গান, পৃ. ৩৮
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিশুর সংলাপ, পৃ. ২৬
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, রাজার সংলাপ, পৃ. ৫২
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, নন্দিনীর গান, পৃ. ৫২
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে', গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, প্রেম পর্যায়, গান - ৩৬
২৪. বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৪৬, পৃ. ১৫২
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, প্রথম দৃশ্য, পঞ্চকের গান, পৃ. ১০
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, শেষ দৃশ্য, দাদাঠাকুরের সংলাপ, পৃ. ৯৬
২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, শোনপাংশুদের সংলাপ, পৃ. ৩৬
২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, পঞ্চকের সংলাপ, পৃ. ৩৬-৩৭
২৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, তৃতীয় শোনপাংশুর সংলাপ, পৃ. ৩৭
৩০. মার্ক্স, কার্ল, 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি (১৮৪৪)', মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা, সম্পাদক সুবোধ সেন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৭২, পৃ. ১১২-১১৩
৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, শোনপাংশুদের গান, পৃ. ৩৭
৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, শোনপাংশুদের গান, পৃ. ৩৯
৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, দ্বিতীয় দৃশ্য, দর্ভকদের গান, পৃ. ৭২
৩৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অচলায়তন, বিশ্বভারতী, ১৯১২, প্রথম দৃশ্য, পঞ্চকের গান, পৃ. ৯১